Rajshahi University journal of arts & law Vol. 49 (2021) pp. 1-9
ISSN 2309-0898

প্রাচীন বাংলার খাদ্য ও খাদ্যাভ্যাস: সাহিত্যনির্ভর অনুসন্ধান

মোছা. সাহিনা আক্তার*

Abstract

An intergral part of the Bengali culture is its food and food habits. The people of ancient Bengal are used to eat different types of foods. From the ancient period till to date the food and food habits of Bengal have gone through many changes. Usually the food and food habits around a locality depend on the geographical and climatic condition, the availability of food and the opportunity of food perservation of that region. Rice was the staple food of the people of ancient Bengal and it was served in many ways. The peope of this land used to eat sweet and betel leaves as dessert. Besides different types of sweet and cakes (pitha) ware also added to food menu at the time of social and religious festivals. It is speculated through the information of different sources that the food menu of ancient Bengal was a unique combination of vegan, non-vegan, sour, sweet, spicy and other food items.

ভূমিকা

মানুষের কল্পনা, চিন্তা-ভাবনা, ধ্যান-ধারণা ইত্যাদি শুধু তার ধর্ম, শিল্পকলা, জ্ঞান-বিজ্ঞানের মধ্যেই আবদ্ধ থাকে না। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে কর্মে ও ব্যবহারে এবং দৈনন্দিন জীবনযাপনের মধ্যে দিয়েও তা প্রকাশিত হয়। দৈনন্দিন যাপিত জীবনের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের দ্বারা যে সত্য ও সৌন্দর্য প্রকাশিত হয় তা মানুষের সংস্কৃতির পরিচয় বহন করে। প্রাচীন বাংলার সংস্কৃতির কথা বলতে গেলে প্রথমেই আসে এখানকার অধিবাসীদের খাদ্য ও খাদ্যাভাস। খাদ্য ও খাদ্যাভাস হলো প্রাত্যহিক জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। বাঙালি জনগোষ্ঠীর খাদ্য ও খাদ্যাভাস, পোশাক-পরিচ্ছেদ, সাজ-সজ্জা, অলংকার বাংলার সমাজব্যবস্থার সুপ্রাচীনকালের ধারাবাহিক জীবনেরই ঐতিহ্যগত প্রতিফলন। তবে প্রাচীন বাংলার দৈনন্দিন জীবনের সুস্পষ্ট চিত্র তুলে ধরার জন্য উৎসের অভাব রয়েছে। খাদ্য, পোশাক-পরিচ্ছেদ, সাজ-সজ্জা, খেলাধুলা, বিনোদন, আনন্দ-উৎসব ইত্যাদি সম্পর্কে কিছু কিছু বিচ্ছিন্ন তথ্য ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। প্রাচীন প্রত্নস্থলগুলো থেকে প্রাপ্ত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন ও সমসাময়িক অভিলেখমালাতে কিছু কিছু তথ্য পাওয়া যায়। তবে এ বিষয়ে সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য এবং বিস্তৃত তথ্য রয়েছে সমসাময়িক সংস্কৃত ও প্রাকৃত অপভ্রংশ সাহিত্যে। প্রাচীন প্রত্নতাত্ত্বিক ধ্বংসাবশেষ থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন, সমসাময়িক অভিলেখমালা, সমসাময়িক সংস্কৃত ও প্রাকৃত অপভ্রংশ সাহিত্য থেকে প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে প্রাচীন বাংলার খাদ্য ও খাদ্যাভাস সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো।

প্রাচীন বাংলায় মানুষের প্রধান খাদ্য ছিল ভাত। তাই সভ্যতার ঊষাকাল থেকে এদেশে প্রধান ও প্রথম উৎপন্ন ফসল ধান। নীহাররঞ্জন রায় বলেন, ভাত ভক্ষণের এই অভ্যাস ও সংস্কার অষ্টিক ভাষাভাষী আদি অস্ট্রেলীয় জনগোষ্ঠীর সভ্যতা ও সংস্কৃতির দান।[১] উঁচুশ্রেণী থেকে নিচু শ্রেণীর লোক সবার খাদ্য তালিকায় ভাতের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। শস্য হিসেবে ধানের উল্লেখ প্রথমে পাওয়া যায় মহাস্থানগড়ে প্রাপ্ত ব্রাহ্মীলিপিতে।[২] প্রস্তরলিপিটির মাধ্যমে কোন এক মৌর্য সম্রাট পুণ্ড্রনগরে নিযুক্ত 'মহামাত্র'কে প্রজাকল্যাণমুখী

* সহযোগী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী ৬২০৫,
E-mail: sahisban@gmail.com

দুটি আদেশ দিয়েছিলেন। এ লিপির কিছু অংশ ভেঙ্গে যাবার কারণে প্রথমে আদেশটি সম্পর্কে তেমন কিছু না জানা গেলেও দ্বিতীয় আদেশটি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা লাভ করা যায়। দ্বিতীয় আদেশটিতে ঐ এলাকায় (পুণ্ড্রবর্ধন) প্রাকৃতিক দূর্যোগের ফলে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে গরীব প্রজাদের মাঝে রাজশস্যভাণ্ডার হতে ধান ও রাজভাণ্ডার থেকে 'কাকনিক' মুদ্রায় সাহায্য প্রদান সম্পর্কে বলা হয়। সুতরাং আনুমানিক খ্রীস্টপূর্ব ৩য় থেকে ২য় শতকের মধ্যে উৎকীর্ণ এ লিপি থেকে বাংলায় ধানের উৎপাদনের বিষয় সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়। পাল যুগে রচিত *রামচরিত* কাব্যেও শস্য হিসেবে ধানের উল্লেখ পাওয়া যায়।[৩] পরবর্তীকালে সেন রাজাদের সময়ে উৎকীর্ণ বিভিন্ন অভিলেখমালাতেও ফসল হিসেবে ধানের উল্লেখ রয়েছে। লক্ষণসেনের আনুলিয়া, তর্পণদীঘি, গোবিন্দপুর ও শক্তিপুর তাম্রশাসনে একটি মঙ্গলাচরণ শ্লোকে ধান উৎপাদনকারী মানুষের আন্তরিক আকুতি ফুটে উঠেছে এভাবে:

বিদ্যুদ্‌যত্র মণিদ্যুতিঃ ফণিপতের্বালেন্দুরিন্দ্রায়ুধং
বারি স্বর্গতরঙ্গিণী সিতশিরোমালা বলাকাবলিঃ।
ধ্যানাভ্যাসমীরণোপনিহিত ঃ শ্রেয়োহঙ্কুরোদ্ভুতয়ে
ভূয়াদ বঃস ভবার্তিতাপভিদুরঃ শম্ভোঃ কর্পদ্দাম্বুদঃ॥

অর্থাৎ, ফণিপতির মণিদ্যুতি যাহাতে বিদ্যুৎস্বরূপ, বালেন্দু ইন্দ্রধনুস্বরূপ স্বর্গতরঙ্গিনী বারিস্বরূপ, শ্বেতকপালমালা বলাকাস্বরূপ, যা ধ্যানাভ্যাসরূপ সমীরণের দ্বারা চালিত এবং যাহা ভবার্তিতাপভেদকারী, শম্ভুর এমন কদর্পরূপ অম্বুদ তোমাদের শ্রেয়শস্যের অঙ্কুরোদগমের কারণ হউক।[৪]

লক্ষণসেনের আনুলিয়া তাম্রশাসনে বলা হয়েছে, ব্রাহ্মণদের যে গ্রামগুলো রাজা দান করতেন সে গ্রামগুলোতে উৎপাদিত অনেক শস্যের মধ্যে শালিধানের ক্ষেতের উল্লেখ আছে।[৫] কেশবসেনের ইদিলপুর তাম্রশাসনেও ধান ও ধান চাষ সম্পর্কে একই রকম বর্ণনা পাওয়া যায়।[৬] শ্রীধরদাসের *সদুক্তিকর্ণামৃত* গ্রন্থে একজন অজ্ঞাত কবির শ্লোকে ধান সমৃদ্ধ বাংলার চিত্র ফুটে উঠেছে এভাবে:

শালিচ্ছেদ-সমৃদ্ধ হালিকগৃহাঃ সংসৃষ্ট –নীলোৎপল-
স্নিগ্ধ-শ্যাম-যব প্ররোহ-নিবিড়ব্যাদীর্ঘ-সীমোদেরাঃ।

অর্থাৎ কৃষকের বাড়ি কাটা শালিধান্যে সমৃদ্ধ হয়ে উঠিয়াছে [আঁটি আঁটি কাটা ধান আঙিনায় স্তূপীকৃত হইয়াছে- পৌষ মাসে এখনও যেমন হয়]; গ্রাম-সীমান্তের ক্ষেতে যে প্রচুর যব হয়েছে তার শীর্ষ নীলোৎপলের মত স্নিগ্ধ শ্যাম।[৭]

বিদ্যাকর রচিত *সুভাষিতরত্নকোষ* কাব্যে বাংলার চিরায়ত ফসল ধান-এর উল্লেখ আছে। এখানে বলা হয়েছে: নতুন পানিতে প্লাবিত ধানের ক্ষেতগুলিতে ব্যাঙ কর্কশ স্বরে ডাকে। কাদামাখা শিশুরা লাঠিহাতে নিয়ে ধানের ক্ষেত্রে মাছ ধরার জন্য ছুটতে থাকে।[৮] একদল ছোট মাছ খাতের পাশ দিয়ে ধান ক্ষেত হতে সরোবরে সাতাঁর কেটে চলে যায়।[৯] শরৎকালের ধান প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়েছে। ধনী পরিবারের দ্বারা ভোজে আমন্ত্রিত হয়ে ব্রাহ্মণগণ অনেক আহার করায় তারা খুব উষ্ণতা বোধ করছে।[১০] হেমন্তে শত পথিক খড় পাবার আশায় কৃষকদের স্তুতি করছে তাই কৃষকেরা গর্বিত।[১১] দিনের শেষে গোষ্ঠীগুলির ধান মাড়াই-এর গোলাকার স্থানগুলো ধানে স্তূপীকৃত হয়ে আছে।[১২] শীতের শেষে প্রথম কলম ধানে পরিপূর্ণ এবং মাটির হাড়িতে রাখা ফসলের গন্ধে ভরপুর কৃষকদের বাড়ি এবং তরুণীদের মসুলপাতের ও তাদের বাহুলতায় ঝন্ ঝন্ শব্দে মুখরিত চারদিক। *আর্যাসপ্তশতী* কাব্যেও ধানের উল্লেখ পাওয়া যায়।[১৩] শ্রীধরদাসের *সদুক্তিকর্ণামৃত* কাব্যে বাংলার ফসল হিসাবে ধানের কথা অনেক শ্লোকে উল্লিখিত হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে, 'প্রচুর জল পেয়ে ধান চমৎকার গজিয়ে উঠেছে। ধেনুগুলিও ঘরে ফিরে এসেছে, ইক্ষুর সমৃদ্ধিও দেখা যাচ্ছে।'[১৪] দিনের শেষে গ্রামের গোষ্ঠীগুলিতে ছড়ানো রয়েছে শালি ধান্য, গোময়ের আগুনে সৃষ্ট হয়েছে ধুম্রবলয়।[১৫] সন্ধ্যাকরনন্দীর '*রামচরিত*' কাব্যের কবিপ্রশস্তিতে গরু দিয়ে ধান মাড়াই করার বর্ণনা

আছে। ধান মাড়াই সম্পর্কে কবিপ্রশস্তিতে বলা হয়েছে যে, গোলাকার করে সাজানো কাটা ধানের উপর দিয়ে ঘুরে ঘুরে বলদ হাঁটিয়ে ধান মাড়াই করা হতো।[১৬] কালিদাসের *'রঘুবংশ'* কাব্যে কৃষাণীদের শালিধান পাহারা দেবার উল্লেখ পাওয়া যায়। সুতরাং বলা যায় ধান ছিল বাংলার প্রধান শস্য। যেহেতু ধান ছিল প্রধান শস্য, সে কারণেই বাংলার আদি অধিবাসীদের প্রধান খাবার ছিল ভাত। *প্রাকৃতপৈঙ্গলে* তৎকালীন বাঙালির একটি খাদ্যে তালিকা বেশ গুরুত্বপূর্ণ–

ওগ্ গরা ভত্তা
রম্ভ অ পত্তা
গাইক ঘিত্তা
দুদ্ধ সজুক্তা
মোইলি মচ্ছা
নালিত গচ্ছা
দিজ্জই কান্তা
খা(ই) পুনবন্তা

অর্থাৎ ওগরা ভাত, রম্ভার পাত, গাওয়া ঘি, জুতসই দুধ, মৌরলা মাছ, নালিতা শাক (পাটশাক) কান্তা রাধিঁয়া দেয়, পুণ্যবান খেতে পারে।[১৭]

*চর্যাপদে*ও ভাতের উল্লেখ আছে। ঢেণ্ডণ পাদের একটি পদে বলা হয়েছে:

টালত মোর ঘর নাহি পড়বেষী।
হাড়ীত ভাত নাহি নিতি আবেসী ॥

অর্থাৎ টিলার উপরে আমার ঘর সেখানে প্রতিবেশী নেই। আমার হাঁড়িতে ভাত নেই, (অথচ) নিত্য প্রেমিক (অতিথি) ভীড় করে।[১৮]

এছাড়া শ্রীহর্ষের *নৈষধচরিত* গ্রন্থে ভাতের সুন্দর বর্ণনা পাওয়া যায়। এ গ্রন্থে বলা হয়েছে:

পরিবেশিত অন্ন হইতে ধূম উঠিতেছে, তাহার প্রত্যেকটি কণা অভগ্ন, একটি হইতে আর একটি বিচ্ছিন্ন (ঝরঝরে ভাত), সে অন্ন সুসিদ্ধ, সুস্বাদু ও শুভ্রবর্ণ ও সৌরভময়।[১৯]

ভাত সাধারণত খাওয়া হতো শাক ও অন্যান্য তরকারি দিয়ে। গরীব ও গ্রামের মানুষদের ভাত খাবার প্রধান তরকারি ছিল বোধ হয় শাক ও সবজি তরকারি। নানান ধরনের শাক খাওয়ার অভ্যাস বাঙালি সুপ্রাচীন। *বৃহদ্ধর্মপুরাণে* হিঞ্চা শাক ও কলমিশাক-এর উল্লেখ আছে।[২০] সবজির মধ্যে বেগুন, লাউ, কুমড়া, ঝিঙে সীম, কাকরোল, কচু প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। তবে বাংলায় সে সময়ে ডাল খাওয়ার খুব বেশি প্রচলন ছিল না বলে মনে হয়। নীহাররঞ্জন রায় বলেছেন, "ডাল খাওয়ার কোনও উল্লেখই কিন্তু কোথাও দেখিতেছি না। উৎপন্ন দ্রব্যের সুদীর্ঘ তালিকায়ও ডালের বা কোন কলাইর উল্লেখ কোথাও যেন নেই।"[২১] তবে বল্লালসেনের *দানসাগর* গ্রন্থে যে, আঠারো প্রকারের শস্যের উল্লেখ আছে তার মধ্যে তিল, মাষ, মুগ, মসুর, কলথ (কুলটি কলাই), আঢ়কী (আড়র), চণক (ছোলা) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।[২২] এছাড়া *বৃহদ্ধর্মপুরাণ* ও *সুভাষিতরত্নকোষে* মসুর, মুগ, তিল, মটর কলাই প্রভৃতি ডালের উল্লেখ আছে। সুতরাং এক্ষেত্রে বলা যেতে পারে যে, তখনকার দিনে ডাল খাওয়ার প্রচলন ছিল, এমন তথ্য তৎকালীন সাহিত্যকর্ম থেকেও পাওয়া যায়। ডাল আর শাকের পরেই আসে মাছের কথা। নদী ও নানা ধরনের জলাশয়ে পরিপূর্ণ বাংলায় সব সময় মাছের প্রাচুর্য ছিল এটা সহজেই অনুমান করা যায়। চন্দ্রকেতুগড়ে প্রাপ্ত একটি পোড়ামাটির ফলকে মাছের চিত্র পাওয়া গেছে। আবার পাহাড়পুর ও ময়নামতিতে প্রাপ্ত পোড়ামাটির অনেক ফলকে মাছ কাটা, ঝুড়িতে করে মাছ নিয়ে যাবার চিত্র দেখতে পাওয়া যায়। সুতরাং মাছ যে বাঙালির অতি প্রাচীন খাদ্যাভ্যাস

তা এসব ফলকই প্রমাণ বহন করে। মাছের মধ্যে রুই, শৈল, পুঁটি, ইলিশ ও অন্যান্য আঁশযুক্ত মাছ বাঙালির প্রিয় ছিল। *বৃহদ্ধর্মপুরাণে* বলা হয়েছে যে, রোহিত, শফর (পুঁটি), সকুল (সোল) এবং শ্বেতবর্ণ ও আঁশযুক্ত অন্যান্য মৎস্য ব্রাহ্মণদের ভক্ষ্য ছিল।[২৩] সব মাছ ব্রাহ্মণদের খাওয়ার নিয়ম ছিল না। যেসব মাছ গর্তে কাদায় বাস করে, যাদের মুখ ও মাথা সাপের মত, যাদের আঁশ নাই সেসব মাছ খাওয়া ব্রাহ্মণদের নিষিদ্ধ ছিল। তবে সাধারণ সকল মানুষ সব মাছই খেতো। এখনকার মতো প্রাচীনকালেও ইলিশ অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। জীমূতবাহন ইলিশ মাছের তেল ও তার অনেক ব্যবহারের কথা বলেছেন। এ থেকে অনুমান করা যায় ইলিশের তেল নানা প্রয়োজনে ব্যবহার করা হতো।[২৪] বাংলার কয়েকটি অংশের মানুষেরা পচা মাছ খেতো না তবে শুটকী মাছ যে তাদের প্রিয় খাদ্য ছিল তা সর্বানন্দের *টীকাসর্বস্বে* বর্ণিত হয়েছে।[২৫] সেযুগেও জাল ও বড়শি দিয়ে মাছ ধরা হতো বলে প্রত্নতাত্ত্বিক ও সাহিত্যিক উৎস থেকে জানা যায়। সরিষা অথবা তিলের তেল ব্যবহার করা হতো মাছ ও অন্যান্য তরকারি রান্নার কাজে। ধনিয়া, গোলমরিচসহ আরো নানা রকমের মশলা রান্নায় ব্যবহার করা হতো।[২৬] মাংসের প্রতিও এতদঞ্চলের মানুষ অনুরক্ত ছিল। তৎকালীন সময়ে হরিণের মাংস খুবই জনপ্রিয় ছিল। *চর্যাপদে* হরিণ শিকারের উল্লেখ পাওয়া যায়।[২৭] এ প্রসঙ্গে চতুর্দিক থেকে আক্রান্ত ভীত সন্ত্রস্ত হরিণের যে বর্ণনা পাওয়া যায় তাও খুব চমৎকার। *চর্যাগীতিতে* বলা হয়েছে:

তিণ ন চ্ছুপই হরিণা পিবই ন পাণী।
হরিণা হরিণীর নিলয় ন জাণী ॥
হরিণী বোলও সুন হরিণা তো।
এ বণ চ্ছাড়ী হোহু ভান্তো ॥
তরংগতে হরিণার খুব ন দাসই।
ভুসুকু ভণই মূঢ়া হিঅহি ন পইসই ॥

অর্থাৎ ভয়ে হরিণ তৃণ ছোয় না, জল খায় না, হরিণ জানে না হরিণীর ঠিকানা। হরিণী (আসিয়া) বলে, শোন হরিণ, এ ধন ছাড়িয়া ভ্রান্ত হইয়া (চলিয়া) যাও। তবে গতিতে ধাবমান হরিণের খুব দেখা যায় না। ভুসুকু বলেন, মূঢ়ের হৃদয়ে এ কথা প্রবেশ করে না।[২৮]

জালের সাহায্যে হরিণ শিকার করা হতো। এ কথার উল্লেখ পাওয়া যায় ভুসুকুর অন্য একটি গীতিতে। একটি পদে ভুসুকু বলেছেন:

জই তুম্হে ভুসুকু অহেরি জাইবেঁ মারিহসি পঞ্চজণা।
নলিনীবন পইসন্তে হোসিসি একুমণা ॥
জীবন্তে ভেলা বিহণি মঝ্রল রঅণি (?)
হণবিণু মাঁসে ভুসুকু পদ্মবণ পইসহিলি ॥
মাআজাল পসরিউ রে বাঁধেলি মাআহরিণী।
সদ্‌গুরুবোহেঁ বুঝিরে কানু কদিনি ॥

অর্থাৎ যদি তুমি ভুসুকু শিকারে যাইবে, তাহা হইলে পাঁচজনকে মার; নলিনী বনে প্রবেশ করিতে একমন হও। জীবন্তে হইল প্রভাত, মরণে হইল রজনী (?); মাংস বিনে ভুসুকু পদ্মবনে প্রবেশ করিল (?)। মায়াজাল প্রসারিত করিয়া বাঁধিলি মায়া-হরিণ; সদ্‌গুরুবোধে বুঝি কাহার কি তত্ত্ব।[২৯]

স্মৃতিশাস্ত্র শাসিত ব্রাহ্মণ্য সমাজে শামুক, কাঁকড়া, মোরগ, সারস, বক, হাঁস, দাত্যুহ পক্ষী, উট, গরু, শুকর প্রভৃতি মাংস একেবারেই নিষিদ্ধ ছিল। তবে গাধা, শশক, সজারু এবং কচ্ছপের মাংস খাওয়াতে তেমন কোনো বাধা নিষেধ ছিল না বলে উল্লেখ করেন শাস্ত্রকার ভট্টভবদেব।[৩০] এক্ষেত্রে নিম্নবর্গের ও আদিবাসী কোমের মানুষদের মধ্যে শামুক, কাঁকড়া, মোরগ প্রভৃতির মাংস, আঁশ ছাড়া মাছ, সাপের মতো

মাছ ও পাখির মাংস সবই খাওয়ার নিয়ম ছিল। ছাগলের মাংসের জনপ্রিয়তা ছিল খুব। *বৃহদ্ধর্মপুরাণে* বিশেষ বিশেষ দিনে মাংস খাওয়া একেবারেই নিষিদ্ধ ছিল বলে উল্লেখ আছে। বলা হয়েছে, 'অমাবস্যা, পূর্ণিমা, চতুর্দশী অষ্টমী, রবিবার, রবিসংক্রান্তি, দ্বাদশ এবং অন্যান্য পুণ্য দিনে মাছ ও মাংস খাওয়া যাবে না।'[৩১] মাছ ও মাংস খাবারের যে বিধি নিষেধ শাস্ত্রকারগণ দিয়েছেন তা শুধু উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণদের জন্য প্রযোজ্য ছিল। *ব্রহ্মবৈর্বত্তপুরাণে* তৃতীয়ায় পটল, চর্তুথীতে মূলা, ষষ্ঠীতে নিম ও চর্তুদশীতে মাষকালাই খাওয়া নিষিদ্ধ হিসাবে উল্লিখিত হয়েছে। ব্রাহ্মণ যদি মসুর ডাল ও মাছ খায় তাহলে দিনরাত উপবাস করে তাকে প্রায়শ্চিত করতে হবে বলে বিধান দেওয়া হয়েছিল। সমাজের নিম্নবর্গের মানুষেরা এই নিয়ম নীতির আওতায় ছিল না। কারণ শাস্ত্রকারগণ মনে করতেন সমাজের উচ্চস্তরের ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চললে সমাজে ধর্ম রক্ষা হবে এবং মানুষের মঙ্গল সাধন হবে। বিয়ের খাবারে সুগন্ধি চালের ভাত, হরিণ, ছাগল বা পাখির মাংসের নানা রকম তরকারি, মাছের নানা পদ, সুগন্ধি ও অনেক মশলা যুক্ত নানা তরকারি, দই ইত্যাদি পরিবেশন করা হতো। পানীয় হিসাবে কর্পূরমিশ্রিত সুগন্ধি জল দেওয়া হতো এবং খাবারের পর নানা মশলাযুক্ত পানের খিলি পরিবেশনের রীতি ছিল।[৩২] এছাড়া দই, পায়েস, ক্ষীর ইত্যাদি দুধের তৈরী খাবার উল্লেখ পাওয়া যায়। এই খাবারগুলো এতদঞ্চলের মানুষের চিরকালই প্রিয় ছিল। পানীয় হিসেবে দুধ ছিল প্রিয়। গার্হস্থ্য জীবনে দুধ-গরু এবং বলদের যে একটি বিশিষ্ট স্থান ছিল তার নানা প্রমাণ চর্যাপদের একাধিক পদে পাওয়া যায়। চাষবাসের জন্য গৃহস্থ বাড়িতে গরু থাকতো এবং এই গরু থেকে দুধের যোগানও আসতো। দুধ দোয়নোর জন্য বিশেষ পাত্রের ব্যবস্থাও ছিল। নিম্নে *চর্যাপদেও* উল্লিখিত পদগুলোতে এসবের প্রমাণ পাওয়া যায়।

দুহিল দুধু কি বেন্টে ষামায় ॥
বলদ বিআত্রল গাবিআ বাঁঝে।
পিটা দুহিত্র এ তিনা সাঁঝে ॥

অর্থাৎ, দোয়ানো দুধ কি বাঁটেই ফিরে যাচ্ছে। বলদ প্রসব করল; গরু বন্ধ্যা; তিন সন্ধ্যায় পিঠা ভরে তাকে সেই দুধকে দোয়ানো হল।[৩৩]

চর্যাপদের অন্য একটি পদে আছে:

দুধ মাঝেঁ লড় চ্ছন্দে ণ দেখই

অর্থাৎ, দুধের মধ্যে স্নেহপদার্থ (সর) থাকলেও দেখতে পায় না।[৩৪]

ফলের মধ্যে কলা, আম, কাঁঠাল, নারিকেল ও ইক্ষুর উল্লেখ পাওয়া যায় সমসাময়িক সাহিত্যকর্মে। *সদুক্তিকর্ণামৃতে* আমের সুগন্ধ ছড়িয়ে পরার সুন্দর বর্ণনা আছে:

কোন বৃক্ষ পুষ্প-প্রস্ফুটনকালে সুগন্ধিযুক্ত হয়, কোন পাদপ ফলোদগমে আমোদিত হয়, কোন তরু ফল পক্ক হলে সুরভিত হয়। কিন্তু কেবল মাত্র আম্রবৃক্ষ হতে ফল পাকা পর্যন্ত সুগন্ধ নির্গত হয়।[৩৫]

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে[৩৬] আম্র, নাগরঙ্গ, পনস, তাল, নারিকেল, জম্মু, বদরী, খর্জ্জুর, গুবাক, আম্রতক, কদলী, শ্রীফল, দাড়িম্ব এবং *বৃহদ্ধর্মপুরাণে*[৩৭] পনস, আম্র, হরীতকী, পিপ্পলী, জীরক, নাগরঙ্গ, তিন্তিড়ী, কদলী, লবণী ও ধাত্রীফলের উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া দেবপালের মুঙ্গের তাম্রশাসন[৩৮] ও নারায়ণ পালের ভাগলপুর তাম্রশাসনে[৩৯] আমের উল্লেখ পাওয়া যায়। এসব উল্লেখ থেকে অনুমান করা যায় তৎকালীন সময়ে বাংলার মানুষের কাছে ফল হিসেবে আম অনেক জনপ্রিয় ছিল। *রামচরিত* কাব্যের তৃতীয় পরিচ্ছেদের ১২ থেকে ১৬ নং শ্লোকে দেবতা ইন্দ্রের নন্দনকানন তুল্য বরেন্দ্রীর ফল ফুল ও বৃক্ষাদি শোভিত বাগানের কথা বর্ণনা আছে। এই বাগানে কন্দ, লকুচ, শ্রীফল, লবলী, নাগরঙ্গ, প্রিয়াল প্রভৃতি বৃক্ষের উল্লেখ আছে।[৪০] *রামচরিত* কাব্যে নারিকেল গাছের উল্লেখও আছে। কবির ভাষায় বরেন্দ্র মাটি নারিকেল উৎপাদনের জন্য খুবই উপযোগী।[৪১]

পানীয় জল হিসাবে প্রাচীন বাংলায় প্রচলিত ছিল দুধ, ডাবের জল, আখের রস, তালরস ও মদজাতীয় নানা প্রকার পানীয়। গুড় থেকে এক প্রকার মদ তৈরি হতো এবং তা প্রসিদ্ধ ছিল সারা ভারতে। এছাড়া বাংলায় ভাত, গম, গুড়, মধু, আখ এবং তালের রস দিয়ে নানা প্রকার মদ তৈরী হয়। *প্রায়শ্চিত্তবিবেক* গ্রন্থে এগারো প্রকারের মদের উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলো হলো– পনস (কাঁঠালের রসে তৈরি), দ্রাক্ষ (দ্রাক্ষ থেকে তৈরি), মাধূক (মধুফলের রসে তৈরি), খার্জ্জুর (খর্জ্জুরের রসে তৈরি), তাল (তাড়ির থেকে তৈরি), ঐক্ষব (ইক্ষুর রসে তৈরি), মাধ্বীক (মধু থেকে তৈরি), টাঙ্ক (প্রসিদ্ধ টাঙ্ক ফল থেকে তৈরি), মৈরেয় (শতমূলীর রস থেকে তৈরি), নারিকেলজ (নারিকেল থেকে তৈরি) ও সুরা (ভাত থেকে তৈরি) তবে সুরা নামের এই মদ অন্য দশ প্রকার মদ থেকে 'নিকৃষ্ট' হিসেবে এই গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে।[৪২] *চর্যাপদের* অনেক পদে মদ্যপান সম্পর্কে বর্ণনা পাওয়া যায়। তা থেকে এটি মনে করা খুব স্বাভাবিক যে, সিদ্ধচার্যরা মদ্য পানকে খুব দোষের চোখে দেখতো না। *চর্যাগীতিতে* শুঁড়িখানার উল্লেখ পাওয়া যায়:

এক সে শুণ্ডিণী দুই ঘরে সান্ধঅ।
চীঅণ বাকলঅ বারুনী বান্ধঅ ॥
সহজে থির কীর বারুণী বান্ধ
জেঁ অজরামর হোই দিঢ় কান্ধ।
দশমি দুআরত চিহ্ন দেখই আ।
আইল গরাহক অপণে বহিআ
চউশঠী ঘড়িয়ে দেত পসারা
পইঠেল গরাহক নাহি নিসারা
এক ঘড়ুলী সরূই নাল
ভণন্তি বিরূআ থির করি চাল।

অর্থাৎ, এক শুঁড়িনী দুই ঘরে ঢোকে। যে চিকণ বাকল দিয়ে বারুণী (মদ) বাঁধে। সহজ পথে স্থির হয়ে বারুণীতে প্রবেশ কর যে, যেন তুমি অজর অমর এবং দৃঢ়স্কন্ধ হতে পার। দশমী দুয়ারে চিহ্ন দেখে (অর্থাৎ শুঁড়ীর ঘরের চিহ্ন দেওয়া আছে দুয়ারেই, যাতে সবাই চিনে নিতে পারে) গ্রাহক নিজেই চলে আসে। চৌষট্টি ঘড়ায় (ঘটিতে) মদ ঢালা হয়েছে। গ্রাহক যে ঘরে ঢুকল তার আর নিষ্ক্রমণ নেই (মদের নেশায় এমনই বিভোর!) সরু নল দিয়ে একটি ঘড়ায় (বা ঘটিতে মদ ঢালা হচ্ছে), বিরুবা বলছেন- সরু নল দিয়ে চাল স্থির করে মদ ঢাল।[৪৩]

চর্যাপদের এই গীত থেকে বোঝা যায় যে, বাংলায় সেই সময় মদের ব্যবসা চলতো এবং শুড়ি খানায় অবাধে মদ ক্রয়-বিক্রয় হতো। শুড়িখানার দরজায় কিংবা দেওয়ালের গায়ে বোধ হয় কোনো চিহ্ন থাকতো, তাই দেখে মদ্যপিপাসুরা জায়গাটি খুঁজে নিতো। অধিকাংশ ক্ষেত্রে নারীরাই মদ্য বিক্রয় করতো। *চর্যাপদের* অপর একটি পদে শবর-শবরীর মদ পান করে মাতাল হবার উল্লেখ আছে। বলা হয়েছে:

ফিটেলি অন্ধারি রে অঅকাশ ফুলিআ ॥
কঙ্গুচিনা পাকেলা রে শবরাশবরি মাতেলা।
অনুদিন শবরো কিম্পি ন চেবই মহাসুহে ভেলা

অর্থাৎ তখন দূর হলো অন্ধকার, আকাশ কুসুমের (মতো)। কংনি দানা পাকলো রে, শবর শবরী মাতেলা; দিনের পর দিন শবর মহাসুখে ভোর থাকার জন্য কিছুই টের পায় না।[৪৪]

সুভাষিতরত্নকোষ, *আর্যাসপ্তশতী*[৪৫] গ্রন্থেও মদ পানের উল্লেখ আছে। মদ্যপান ব্রাহ্মণদের জন্য মনে হয় নিষিদ্ধ ছিল। *প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব* গ্রন্থে মদপান পাপ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে গৌড়ী, মাধ্বী ও পেষ্টী এই তিন প্রকার মদ পান করা ব্রাহ্মণের জন্য পাপ। তবে বৈশ্য ও ক্ষত্রিয়ের পক্ষে কেবলমাত্র পেষ্টী

মদপানই পাপ। এই পাপকাজের জন্য নানাপ্রকার প্রায়শ্চিত্তের কথাও এই গ্রন্থে বলা হয়েছে।[৪৬] মদ পানের ক্ষেত্রে বিধি নিষেধ থাকলেও পাল ও সেন যুগে মদ পানের প্রচলন ছিল তা সহজেই অনুমান করা যায় তবে সমাজে তা ছিল নিন্দনীয়।

উপসংহার

পরিশেষে এ কথা বলা যায় যে, বাংলা ও বাঙালির খাদ্য এবং খাদ্যাভাস প্রবাহমান নদীর মতো। এই নদীর জলে মিশেছে পেরিয়ে আসা চার হাজার বছরের পরিচয়ের শিকড়। এই ভূ-খণ্ডের সাধারণ জনগোষ্ঠী এবং তাদের একটি বড় অংশ যারা ধীরে ধীরে বাঙালি জনগোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছে তাদের খাদ্য ও খাদ্যাভ্যাসে তাই দেখা যায় সামাজিক ও ধর্মীয় রীতিনীতির সাথে সাথে ভৌগোলিক ও জলবায়ুগত প্রতিফলন। ভৌগোলিক কারণেই আদিবাসী কৌম সমাজের উত্তরাধিকারি হিসেবে কৃষি প্রধান বাংলার খাদ্য হয়ে উঠে ভাত। ভাত খাওয়া হতো নানা রকম তরকারি সহকারে। নদীবহুল বাংলায় নানা ধরনের মাছ পাওয়া যেত। তাই মাছ ছিল খাবারের তালিকায়। মাংসও খাবার তালিকায় পাওয়া যেত। এছাড়া নানা রকমের শাক-সবজি খাবারের তালিকায় স্থান করে নিয়েছিল। পানীয় হিসেবে দুধ, নারিকেল, পানি, ইক্ষুরস ও তালরস গ্রহণ করা হতো। এছাড়া মদ পান করবার অভ্যাস প্রাচীন বাংলায় প্রচলিত ছিল। খাবারের শেষপাতে থাকতো দুধের তৈরি নানা রকম মিষ্টি, দই, পায়েস এবং শেষে পরিবেশিত হতো নানান মশলাযুক্ত সুগন্ধি পান। প্রাচীনযুগ থেকে মধ্যযুগ পেরিয়ে বর্তমান সময় পর্যন্ত বাঙালির খাদ্য ও খাদ্যাভ্যাসের মূল কাঠামোটি মোটামুটি ঠিক থাকলেও সময়ের ব্যবধানে বাংলায় নানা জনগোষ্ঠীর আগমনের ফলে খাদ্য ও খাদ্যাভ্যাসে যুক্ত হয়েছে নানান নতুন অনুষঙ্গ, যা বর্তমান বাঙালির খাদ্য ও খাদ্যাভ্যাসকে করে তুলেছে বৈচিত্র্যময়। এখনও অধিকাংশ বাঙালির প্রধান খাদ্য ভাত। সাধারণত চাল দিয়ে ভাত রান্না করে নানা রকমের তরকারি দিয়ে খাওয়া হয়। তরকারি হিসেবে থাকে মাছ, মাংস শাক-সবজি ও ডাল। শেষপাতে থাকে মিষ্টান্ন ও পান-সুপারি। বাংলা ও বাঙালির এই বৈচিত্র্যময় ও ঐতিহ্যবাহী খাবারের ধারাবাহিকতা কালের সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে নিজস্ব শ্বাশত রূপসহ বর্তমান সময়ে উপনীত হয়েছে।

তথ্যনির্দেশ

১ নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস আদিপর্ব* (কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ১৪০২), পৃ. ৪৪৩।

২ Ramaranjon Mukherji and Sachindra Kumar Maity, *Corpus of Bengal Inscriptions Bearing on History and Civilization of Bangal* (Calcutta: Firma K.L. Mukhopadhyay, 1967), p. 39.

৩ R.C. Majumdar, R.G. Basak and N.G. Banerji (eds.), *Ramacaritam of Sandhyakaranandi* (Rajshahi: Varendra Research Museum, 1939), V. 17, p. 191.

৪ N.G Majumdar (ed.), *Inscriptions of Bengal,* Vol. III (Rajshahi: The Varendra Research Society, 1929), p. 85,88,94,100, উদ্ধৃত: নীহাররঞ্জন রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৮।

৫ *Ibid*, pp. 89-90. লাইন23-24.

৬ *Ibid*, p. 129.

৭ Sures Chandra Banerji (ed.), *Saduktikarnamrta of Sridharadasa* (Calcutta: Firma K.L Mukhapaddya, 1965), V. 1353, p. 363, উদ্ধৃত: নীহাররঞ্জন রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৫।

৮ Daniel H.H. Ingalls (Tr.), *An Anthology of Snaskrit Court Poetry Vidyakara's Subhasitaratankosa* (Harvard: Harvard University press 1965), V. 226, p. 129.উদ্ধৃত: শাহানারা হোসেন, *প্রাচীন বাংলার ইতিহাস* (রাজশাহী: ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১২), পৃ. ১০৭।

৯ *Subhasitanatnakosa,* V. 282, p. 139.

[১০] *Ibid*, V. 291, p. 141.
[১১] *Ibid*, V. 297, p. 143.
[১২] *Ibid*, V. 303, p. 144.
[১৩] জাহ্নবী কুমার চক্রবর্তী, *আর্যাসপ্তশতী ও গৌড়বঙ্গ* (কলকাতা: সান্যাল এন্ড কোম্পানি, ১৩৭৮), শ্লোক ৫৮, পৃ. ১৫৯।
[১৪] Sures Chandra Banerji (ed.), *Saduktikarnamrta* (Calcutta: Farma K.L Mukhapaddya, 1965), V. 2241, pp. 608-609.
[১৫] *Ibid*, V. 1351, p. 363.
[১৬] R.C. Majumdar and Others (eds.), *Ramacaritam of Sandhyakaranandi* (Rajshahi: Varendra Research Museum, 1939), V. 16, p. 162.
[১৭] চন্দ্রমোহন ঘোষ (সম্পাদিত), *প্রাকৃতপৈঙ্গল* (কলকাতা: বিবলিওয়েকা ইন্ডিকা-১৯০২), পৃ. ৪০৩; উদ্ধৃত: সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*, পৃ. ৬০।
[১৮] অতীন্দ্র মজুমদার (সম্পাদিত), *চর্যাপদ*, পদ নং ৩৩ (ঢাকা: দি স্কাই পাবলিশার্স, ২০১৬), পৃ. ১৩৫।
[১৯] নীহাররঞ্জন রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৪৪।
[২০] পঞ্চানন তর্করত্ন (সম্পা.), *বৃহদ্ধর্মপুরাণ*, উত্তর খণ্ড, দ্বিতীয় অধ্যায় (কলকাতা: নবভারত পাবলিশার্স, ১৩৯৬), পৃ. ২৯২।
[২১] নীহাররঞ্জন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৪৪।
[২২] শ্যামাচরণ কবিরত্ন (সম্পা.), *দানসাগর*, শ্লোক ৪৩৩ (কলকাতা: সাহিত্য সভা, ১৯৩৯), পৃ. ১১৭।
[২৩] *বৃহদ্ধর্মপুরাণ*, উত্তর খণ্ড, পঞ্চম অধ্যায়, পৃ. ৩০৬।
[২৪] নীহাররঞ্জন রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৪৬।
[২৫] R.C. Majumdar (ed.), *History of Bengal*, Vol. I (Dacca: University of Dacca, 1943), p. 621.
[২৬] শাহানারা হোসেন, *প্রাগুক্ত*,পৃ. ১২২।
[২৭] শশিভূষণ দাশগুপ্ত, *বৌদ্ধধর্ম ও চর্যাগীতি* (কলকাতা: ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, ১৩৯০), পদ নং ৬, পৃ. ১১২।
[২৮] নীলরতন সেন (সম্পা.), *চর্যাগীতিকোষ* (কলকাতা: দীপালি সেন, ১৩৮৪), গীত নং ৬, পৃ. ১৩১।
[২৯] শশিভূষণ দাশগুপ্ত,*প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৩, পদ নং ২৩।
[৩০] গিরিশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ (সম্পা.), *প্রায়শ্চিত্তপ্রকরণম* (রাজশাহী: বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটি, ১৯২৭), পৃ. ৬৬-৬৭।
[৩১] *বৃহদ্ধর্মপুরাণ*, উত্তর খণ্ড, পঞ্চম অধ্যায়, পৃ. ৩০৬।
[৩২] নীহাররঞ্জন রায়, *প্রাগুক্ত*, ৪৪৫।
[৩৩] অতীন্দ্র মজুমদার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৫।
[৩৪] ঐ, পৃ. ১৪৬।
[৩৫] *Saduktikarnamrta*, ৪/৫৩/৫, উদ্ধৃত: রফিকুল ইসলাম, *প্রাচীন বাংলার সামাজিক ইতিহাস: সেনযুগ* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০১), পৃ. ১৫৩।
[৩৬] পঞ্চানন তর্করত্ন (সম্পা.), *ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ* (কলকাতা: নবভারত পাবলিশার্স, ১৩৯১), শ্রীকৃষ্ণ জন্ম খণ্ড, সপ্তদশ অধ্যায়, পৃ. ৩৬৬।
[৩৭] *বৃহদ্ধর্মপুরাণ*, উত্তর খণ্ড, পঞ্চম অধ্যায়, পৃ. ৩০৪।
[৩৮] অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়, *গৌড়লেখমালা* (রাজশাহী: বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি, ১৩১৯), পৃ. ৩৯।
[৩৯] ঐ, পৃ. ৬১
[৪০] চিত্তরঞ্জন মিশ্র, '*রামচরিত* কাব্যে বর্ণিত বরেন্দ্রীয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য', আবুল কাশেম (সম্পা.), *স্থানীয় ইতিহাস* (রাজশাহী: হেরিটেজ আর্কাইভস অব বাংলাদেশ হিস্ট্রি ট্রাস্ট), পৃ. ২।
[৪১] ঐ, পৃ. ৪।
[৪২] জগদানন্দ গোস্বামী (সম্পাদিত), *প্রায়শ্চিত্তবিবেক* (কলকাতা: প্রকাশকের নাম অজ্ঞাত), পৃ. ৯৫।

[৪৩] সৈয়দ আলী আহসান, *চর্যাগীতি প্রসঙ্গ* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫), পদ নং ৩, পৃ. ১৫৩ ও ১৯৯, ।

[৪৪] অতীন্দ্র মজুমদার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৪।

[৪৫] জাহ্নবী কুমার চক্রবর্তী, *প্রাগুক্ত*, শ্লোক ৪২৫, পৃ. ২৪১।

[৪৬] রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য, *প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব*, রাধামোহন ভট্টাচার্য্য টীকা সম্বলিত, হৃষীকেশ (অনূ.) (কলকাতা: বঙ্গবাসী প্রেস, ১৩১৬), পৃ. ৭।